অধ্যায় ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

বিষয় ঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

শ্রেণি ঃ নবম

প্রথম অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আমাদের বাংলাদেশ

১. প্রশ্নঃ ই- গভর্ন্যান্স বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ গভর্ন্যান্স বা সুশাসনের জন্য দরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা। ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে সরকারি ব্যবস্থাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। এর ফলে নাগরিকের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান ঘটে এবং দেশে সুশাসনের পথ নিষ্কণ্টক হয়। শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই হচ্ছে ই- গভর্ন্যান্স।

২. প্রশ্নঃ একুশ শতকে টিকে থাকার প্রয়োজনীয় দক্ষতার ব্যাপারে তোমার মতামত উপস্থাপন কর।

উত্তরঃ একুশ শতকে টিকে থাকার প্রয়োজনীয় দক্ষতার ব্যাপারে রাশেদের আমার মতামত হলো সবাইকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রাথমিক বিষয়গুলো জানতে হবে। কেননা একুশ শতকে এসে সম্পদের ধারণা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। পৃথিবী একটা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির উপর দাঁড়াতে শুরু করেছে। তাই যারা এখন জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তৈরি করার বিপ্লবে অংশ নিবে তারাই পৃথিবীর চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। তবে এই নতুন বিপ্লবে অংশ নেয়ার জন্য বিশেষ এক ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে বেঁচে থাকার সুনির্দিষ্ট দক্ষতাগুলো যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে সেগুলো হবে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, যোগাযোগ দক্ষতা, সুনাগরিকত্ব, সমস্যা সমাধানে পারদর্শিতা, বিশ্লেষণী চিন্তন দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং তার সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা। এসব দক্ষতার মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা হিসেবে খুব দ্রুত স্থান করে নিচ্ছে। তাই একুশ শতকে টিকে থাকার জন্য সবাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রাথমিক বিষয়গুলো জানতে হবে।

৩. প্রশ্নঃ একুশ শতকের সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ একুশ শতকের সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। যার অর্থ কৃষি, খনিজ সম্পদ কিংবা শক্তির উৎস নয়, শিল্প কিংবা বাণিজ্য নয় এখন পৃথিবীর সম্পদ হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তার কারণ শুধু মানুষই জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারে, জ্ঞান ধারণ করতে পারে এবং জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে। সম্পদের এই নতুন ধারণাটি মানুষের চিন্তা ভাবনার জগৎটি পাল্টে দিয়েছে।

৪. প্রশ্নঃ "একুশ শতকের বিশ্বায়নের ধারণা" ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ একুশ শতকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্বায়ন (এষড়নধষবুধঃরড়হ)- এর ধারণাটি ত্বরান্বিত হচ্ছে। একটি সময় ছিল যখন দেশের সীমানা তার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন আর এটি সত্য নয় বরং বিশ্বায়নের কারণে দেশের সীমা নিজের দেশের গ ি ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন-এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা যেখানে আছে সেই অংশটুকুই বাংলাদেশ। এই অর্থে বাংলাদেশের সীমানা ছড়িয়ে গেছে।

৫. প্রশ্নঃ ই-পর্চা কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে সংগ্রহ করাকে বলা হয় ই-পর্চা। পূর্বে পর্চা সংগ্রহ করার জন্য আবেদনকারীকে যেমন সরাসরি উপস্থিত হতে হতো তেমনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরাও গতানুগতিক পদ্ধতিতে পর্চা তৈরি করতেন। বর্তমানে এটি ই-সেবার আওতায় আসাতে আবেদনকারী যেকোনো স্থান থেকেই নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে পর্চা সংগ্রহ করতে পারেন।

৬. প্রশ্নঃ ই-সেবা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে যেকোনো ধরনের সেবা প্রদানকে ই-সার্ভিস বা ই-সেবা বলে। ই-সেবার বৈশিষ্ট্য হলো। এটি অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে এবং হয়রানিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করে।

skillnubd.com

৭. প্রশ্নঃ এমটিএস বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেমকে সংক্ষেপে এমটিএস বলে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেমের মাধ্যমে দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিরাপদে, দ্রুত, কম খরচে টাকা পাঠানো যায়। ১ মিনিটের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাঠানো যায়। দেশের প্রায় সকল ডাকঘরে এই সেবা পাওয়া যায়

৮. প্রশ্নঃ অ্যাডা লাভলেসকে কেন প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক বলা হয়?

উত্তরঃ অ্যাডা লাভলেস ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতি ভীষণ আগ্রহী ছিলেন। চার্লস ব্যাবেজ যখন ডিফারেনস ইঞ্জিন ও এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামক দুইটি গণনা যন্ত্র তৈরি করেন তখন তিনি গণনার কাজটিকে কীভাবে আরও কার্যকর করা যায় তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। ১৮৩৩ সালে চার্লস ব্যাবেজের সাথে তার পরিচয় হলে তিনি এনালিটিক্যাল ইঞ্জিনকে কাজে লাগানোর জন্য 'প্রোগামিং' এর ধারণা সামনে নিয়ে আসেন। এ কারণে তাকে প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক বলা হয়।

৯. প্রশ্নঃ ই-সেবা সম্পর্কে লেখ।

উত্তরঃ বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকরা এখন মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এজন্য দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে একটি করে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে। দেশের যেকোনো নাগরিক এভাবে যেকোনো চিকিৎসকের পরামর্শ পেতে পারেন। এছাড়া দেশের কয়েকটি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে রোগী উপজেলা থেকে জেলা সদরে না এসেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা ও পরামর্শ পাচ্ছেন।

১০.প্রশ্নঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে অ্যাডা লাভলেসের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ আধুনিক কম্পিউটারের জনক চার্লস ব্যাবেজ ডিফারেন্স ইঞ্জিন ও এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামে দুইটি গণনা যন্ত্র তৈরি করেন। এই ইঞ্জিনগুলো যান্ত্রিকভাবে গণনার কাজ করতে পারত। তবে গণনার কাজটি কীভাবে আরও কার্যকর করা যায় তা নিয়ে কাজ করেছিলেন অ্যাডা লাভলেস। তিনি লর্ড বায়রনের কন্যা। মায়ের কারণে তিনি ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞান ও গণিতে আগ্রহী ছিলেন। ১৮৩৩ সালে চার্লস ব্যাবেজের সাথে তার পরিচয় হলে তিনি এনালিটিক্যাল ইঞ্জিনকে কাজে লাগানোর জন্য প্রোগ্রামিং এর ধারণা সামনে নিয়ে আসেন। এ কারণে তাকে প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক হিসেবে সম্মানিত করা হয়। ১৮৪২ সালে চার্লস ব্যাবেজ তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ইঞ্জিন সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। সে সময় অ্যাডা লাভলেস ব্যাবেজের সহায়তা নিয়ে পুরো বক্তব্যের সঙ্গে ইঞ্জিনের কাজের ধারণাটি বর্ণনা করেন। কাজের ধারা বর্ণনা করার সময় তিনি এটিকে ধাপ অনুসারে ক্রমাঙ্কিত করেন। অ্যাডা লাভলেসের মৃত্যুর ১০০ বছর পর ১৯৫৩ সালে সেই নোট আবার প্রকাশিত হলে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, অ্যাডা লাভলেস তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে অ্যালগরিদম প্রোগ্রামিংয়ের ধারণাটাই প্রকাশ করেছিলেন।

১১. প্রশ্নঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন ও স্টিভ জবসের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ**রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন :** বিশ শতকে ইলেকট্রনিক্সের বিকাশের পর প্রথমে আইবিএম কোম্পানি মেইনফ্রেম কম্পিউটার তৈরি করে পর্যায়ক্রমে ১৯৭১ সালে মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কৃত হলে সাশ্রয়ী কম্পিউটার তৈরির পথ সুগম হয়। বিশ শতকের ষাট সত্তরের দশকে ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহার করে আরপানেটের জন্ম হয়। তখন থেকে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটারসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিকশিত হতে শুরু করে। আর এই বিকাশের ফলে তৈরি হয় ইন্টারনেট। ১৯৭১ সালে আরপানেটে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পত্রালাপের সূচনা করেন আমেরিকার প্রোগ্রামার রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন। তিনিই প্রথম ই-মেইল সিস্টেম চালু করেন।

স্টিভ জবস : মাইক্রোপ্রসেসরের আবির্ভাবের পর স্টিভ জবস ও তার দুই বন্ধু স্টিভ জজনিয়াক ও রোনাল্ড ওয়েনে ১৯৭৬ সালের ১ এপ্রিল অ্যাপল কম্পিউটার নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের হাতেই পার্সোনাল কম্পিউটারের নানা পর্যায় বিকশিত হয়েছে।

১২.প্রশ্নঃ ই-লার্নিং সম্পর্কে যা জান লেখ।

উত্তরঃ ই-লার্নিং শব্দটি ইলেকট্রিক লার্নিং কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। এটা বলতে আমরা পাঠদান করার জন্য সিডি রম, ইন্টারনেট, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহার করার পদ্ধতিকে বুঝে থাকি। তবে এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে ই-লার্নিং সনাতন পদ্ধতিতে পাঠদানের বিকল্প নয়, এটা সনাতন পদ্ধতির পরিপূরক।

skillnbd.com

বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই ই-লার্নিংয়ের জন্য নানা উপকরণ তৈরি হতে শুরু করেছে। পৃথিবীর বড় বড় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অসংখ্য কোর্স অনলাইনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং যে কেউ সেই কোর্সটি গ্রহণ করতে পারে। বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে এবং অনেক সময়ই একজন সেই কোর্সটি নেয়ার পর তার হোমওয়ার্ক জমা দিয়ে কিংবা অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে সেই কোর্সটির প্রয়োজনীয় ক্রেডিট অর্জন করতে পাচ্ছে।

আমাদের বাংলাদেশও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের প্রযুক্তিবিদরা বাংলা কোর্স দেবার জন্য বেশ কিছু ওয়েবসাইট পোর্টাল তৈরি করেছেন এবং সারা পৃথিবী থেকে যে কেউ বাংলা ভাষায় সেই কোর্সগুলো গ্রহণ করতে পারবে। তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষ করে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার উপযোগী এই ধরনের সাইটগুলো দেশে-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

১৩.প্রশ্নঃ আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবসায় ই-লার্নিং এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ আমাদের দেশের জনগোষ্ঠী বিশাল। সে কারণে স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যাও বিশাল। নানা ধরনের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আমাদের স্কুলগুলোতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম বলতে গেলে নেই। ল্যাবরেটরি অপ্রতুল, ফলে হাতে কলমে বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ খুব কম। এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ই-লার্নিং অনেক বড় একটা ভূমিকা রাখতে পারে। দক্ষ একজন শিক্ষকের পাঠদান ভিডিও করে নিয়ে সেটা অসংখ্য স্কুলে বিতরণ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে বোঝানোর জন্য অনেক ধরনের সহায়ক প্রক্রিয়া ছাত্রছাত্রীদের দেয়া যেতে পারে। একজন শিক্ষক চাইলে নিজেই তার পাঠদানে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় তৈরি করতে পারেন এবং সেটি বারবার ব্যবহার করতে পারেন।

আমাদের দেশে উত্তম পাঠদানের সীমাবদ্ধতা দূর করার ব্যাপারে ই-লার্নিং অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারলেও এক্ষেত্রে আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, এটি কোনোভাবেই প্রচলিত পাঠদানের বিকল্প নয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে পাঠদানের সময় একজন শিক্ষক সরাসরি শিক্ষার্থীদের দেখতে পারেন, তাদের সাথে কথা বলতে পারেন, ভাব বিনিময় করতে পারেন। কিন্তু ই-লার্নিংয়ের বেলায় এই বিষয়গুলো প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে বলে এই পদ্ধতিটাকে অনেকের কাছে যান্ত্রিক মনে হতে পারে। তাই এই পদ্ধতিতে সফল করতে শিক্ষার্থীদের অনেক উদ্যোগী হতে হবে। ইন্টারনেটের স্প্রিড বৃদ্ধি করতে হবে, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং শিখন সামগ্রী তৈরি করতে হবে।

১৪.প্রশ্নঃ ই-গভর্ন্যান্স কী? শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

শিক্ষাক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্সের প্রভাব : একটা সময় ছিল যখন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করা ছিল পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য এক বিড়ম্বনার ব্যাপার। বিশেষ করে প্রধান প্রধান শহর থেকে দূরবর্তী গ্রামে অবস্থানরতদের পক্ষে এটি ছিল দুষ্কর। মাত্র দুই দশক আগেও এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সাত দিন পরও অনেকেই তাদের ফলাফল জানতে পারত না। কিন্তু বর্তমান ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল জানা যায়। ফলে, ফলাফল জানার যে বিড়ম্বনা ছিল সেটির অবসান হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্সের আর একটি উদাহরণ হলো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোবাইল ফোনে আবেদন করার সুবিধা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় , পূর্বে সিলেট জেলার একজন শিক্ষার্থী যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক হলে তাকে অনেকগুলো কাজ সম্পন্ন করতে হতো। এজন্য সশরীরে অথবা প্রতিনিধিকে যশোর গিয়ে একবার ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ এবং পরে আবার আবেনপত্র জমা দিতে হতো। বর্তমানে মোবাইল ফোনেই এই আবেদন করা যায়। ফলে, ভর্তিচ্ছুদের ভর্তির আবেদন ফরম জোগাড় ও জমা দেওয়ার জন্য শহর থেকে শহরে ঘুরতে হয় না।

১৫.প্রশ্নঃ বাংলাদেশের নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নে ই-গভর্ন্যান্সের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ ই-গভর্ন্যান্স হচ্ছে শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ই-গভর্ন্যান্সের ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করে বাংলাদেশ সরকার এদেশের শাসন ব্যবস্থায় ই-গভর্ন্যান্সের প্রচলন শুরু করেছে। নিচে বাংলাদেশের নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নে ই-গভর্ন্যান্সের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হলো :

skillhubbd.com

নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নে সুশাসনের কোনো বিকল্প নেই। আর দেশে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা। ই-গভর্ন্যান্স প্রচলনের ফলে নাগরিকের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান ঘটে এবং দেশে সুশাসনের পথ নিষ্কণ্টক হয়। আমাদের দেশে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল সেবা স্বল্প সময়ে, কম খরচে এবং ঝামেলাহীনভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য চালু করা হয়েছে জেলা ই-সেবা কেন্দ্র। এর ফলে আগে যেখানে কোনো কোনো সেবা পেতে আমাদের ২-৩ সপ্তাহ লাগত, সেটি এখন মাত্র ২-৩ দিনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি। শুধু তাই নয়, তথ্যের ডিজিটালকরণের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের ৮০-৯০ শতাংশ সময় কম লাগছে। সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন দলিল, পর্চা প্রভৃতির নকল প্রধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সক্ষমতাও ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশে নাগরিক যন্ত্রণার আর একটি উদাহরণ হলো পরিসেবাসমূহের বিল পরিশোধ। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদির বিল পরিশোধের গতানুগতিক পদ্ধতি খুবই সময়সাপেক্ষ এবং যন্ত্রণাদায়ক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ কর্মময় দিন বিদ্যুৎ বিল পরিশোধেই নাগরিককে ব্যয় করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে মোবাইল ফোন কিংবা অনলাইনে এই বিল পরিশোধ করা যায়। ই-গভর্ন্যান্সের মূল বিষয় হলো নাগরিকের জীবনমান উন্নত করা এবং হয়রানিমুক্ত রাখা। ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে কোনো কোনো কার্যক্রমের সময় ২৪ × ৭ × ৩৬৫ দিনে পরিণত করা যায়। ফলে, নাগরিকরা নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারে।

১৬.প্রশ্নঃ বাংলাদেশে ই-গর্ভন্যান্সের সুবিধাসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তরঃ শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্স। গভর্ন্যান্স প্রচলনের ফলে সরকারি ব্যবস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় এর ফলে নাগরিকের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান ঘটে এবং সুশাসনের পথ নিষ্কণ্টক হয়। এজন্য বাংলাদেশ সরকার দেশের শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্স চালু করেছে। এ কারণে বাংলাদেশের নাগরিক নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ ভোগ করতে পাচ্ছে :

১. বর্তমানে এসএসসি, এইচএসসিসহ সকল পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে জানা যায়।

২. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য মোবাইল ফোনে আবেদন করা যায়।

৩. সরকারি কার্যালয়ের যেসব সুবিধা পেতে আগে ২/৩ সপ্তাহ লেগে যেত এখন মাত্র ২/৩ দিনে পাওয়া যায়।

৪. তথ্যের ডিজিটালকরণের ফলে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে ৮০-৯০ শতাংশ সময় কম লাগে।

৫. সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে নাগরিক যেকোনো সেবা অতি দ্রুত পাওয়া যায়।

৬. খুব অল্প সময়ে ঝামেলাহীনভাবে মোবাইল ফোন বা অনলাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিল পরিশোধ করা যায়।

১৭. প্রশ্নঃ ই-সার্ভিস কী? বাংলাদেশ সরকারের চালু করা কয়েকটি ই-সার্ভিসের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ **ই-সার্ভিস :** ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে যেকোনো ধরনের সেবা প্রদান করাকে ই-সার্ভিস বা ই-সেবা বলে। ই-সেবার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ে এবং হয়রানিমুক্ত সেবা প্রদান করে।

বাংলাদেশ সরকারের চালু করা ই-সার্ভিসসমূহ : বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরসমূহের উদ্যোগে এদেশের নাগরিকদের জন্য অনেক ই-সেবা চালু হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ই-সেবা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হলো :

ক. **ই-পূর্জি :** পূর্জি হচ্ছে চিনিকলসমূহে কখন আখ সরবরাহ করতে হবে সে জন্য আওতাধীন আখচাষিদের দেওয়া একটি অনুমতিপত্র। আখচাষিরা এখন এসএমএসের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পূর্জির তথ্য পাচ্ছে বলে এখন তাদের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান হয়েছে। পাশাপাশি সময়মতো আখের সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় চিনিকলের উৎপাদনও বেড়েছে।

খ. **ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম (এমটিএস) :** বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেমের মাধ্যমে দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিরাপদে, দ্রুত ও কম খরচে টাকা পাঠানো যায়। ১ মিনিটের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাঠানো যায়।

skillnubd.com

গ. **ই-পর্চা সেবা :** বর্তমানে দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে সংগ্রহ করা যায়। এটিকে বলা হয় ই-পর্চা।

পূর্বে পর্চা সংগ্রহ করার জন্য আবেদনকারীকে যেমন সরাসরি উপস্থিত হতে হতো তেমনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরাও গতানুগতিক পদ্ধতিতে পর্চা তৈরি করতেন। বর্তমানে এটি ই-সেবার আওতায় আসাতে আবেদনকারী যেকোনো স্থান থেকেই নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে পর্চা সংগ্রহ করতে পারেন।

ঘ. **ই-স্বাস্থ্যসেবা :** বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকরা এখন মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এজন্য দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে একটি করে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে। দেশের যেকোনো নাগরিক এভাবে যেকোনো চিকিৎসকের পরামর্শ পেতে পারেন। এছাড়া দেশের কয়েকটি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে রোগী উপজেলা থেকে জেলা সদরে না এসেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা ও পরামর্শ পাচ্ছেন।

ঙ. **রেলওয়ের ই-টিকেটিং ও মোবাইল টিকেটিং :** বাংলাদেশ রেলওয়ের কয়েকটি আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট এখন মোবাইল ফোনেও কাটা যায়। আবার অনলাইনেও টিকিট কাটার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে, নিজের সুবিধামতো সময়ে রেলস্টেশনে না গিয়েও নির্দিষ্ট গন্তব্যের টিকিট কাটা সম্ভব হচ্ছে।

১৮.প্রশ্নঃ ই-কমার্স সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তরঃ একটি দেশের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের কোনো বিকল্প নেই। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ, ইন্টারনেটের উদ্ভব ও বিকাশ এবং কাগজের মুদ্রার বাইরেও ইলেকট্রনিক বিনিময় প্রথা চালু হওয়ার ফলে বাণিজ্যেরও একটি সর্বশেষ পরিবর্তন হয়েছে। এখন ইলেকট্রনিক মাধ্যমেও বাণিজ্য করা যায়, যার প্রচলিত নাম ই-কমার্স বা ই-বাণিজ্য।

যেকোনো পণ্য বা সেবা বাণিজ্যের কয়েকটি শর্ত থাকে। প্রথমত বিক্রেতার কাছে পণ্য থাকা এবং ক্রেতা কর্তৃক তার বিনিময় মূল্য পরিশোধ করা। এর প্রধান পদ্ধতি হলো বিক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার সরাসরি যোগাযোগ। কিন্তু ইন্টারনেটের যুগে একজন বিক্রেতা তার পণ্যের ছবি, ভিডিও দিয়ে ইন্টারনেটেই তার দোকানটি খুলে বসতে পারেন। এজন্য তার প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়েবসাইট চালু করতে হয়। ক্রেতা অনলাইনে তার পছন্দের পণ্যটি পছন্দ করেন এবং মূল্য পরিশোধ করেন। দেশে বর্তমানে বিভিন্ন ডেবিট বা কেডিট কার্ডের মাধ্যমে এই মূল্য পরিশোধের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও মূল্য পরিশোধ করা যায়। মূল্য প্রাপ্তির পর বিক্রেতা তার পণ্যটি ক্রেতার ঠিকানায় নিজে অথবা পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের (কুরিয়ার সার্ভিস) মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন।

মোবাইল বা কার্ড ছাড়াও ই-কমার্সে আরও একটি বিল পরিশোধ পদ্ধতি রয়েছে। এটিকে বলা হয় প্রাপ্তির পর পরিশোধ বা ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD)। এই পদ্ধতিতে ক্রেতা বিক্রেতার ওয়েবসাইটে বসে পছন্দের পণ্যটির অর্ডার দেন। বিক্রেতা তখন পণ্যটি ক্রেতার কাছে পাঠিয়ে দেন। ক্রেতা পণ্য পেয়ে বিল পরিশোধ করেন।

ই-কমার্সে দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান লক্ষ করা যায়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কেবল নিজেদের পণ্য বিক্রয় করে থাকে। আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয় করে।

১৯.প্রশ্নঃ বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে আইসিটির প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও এখন কর্মক্ষেত্রে আইসিটির বহুমুখী প্রভাব ও ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে। এই প্রভাব ও পরিসর ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আইসিটির দুই ধরনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রথম প্রচলিত কর্মক্ষেত্রগুলোতে আইসিটির প্রয়োগের ফলে কর্মদক্ষতার বৃদ্ধি এবং বাজার সম্প্রসারণ, অন্যদিকে আইসিটি নিজেই নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে।

অন্যদিকে আইসিটি নিজেই একটি বড় আকারের কর্মবাজার সৃষ্টি করেছে। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার থেকে শুরু করে ওয়েবসাইট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি এখন নতুন দক্ষ কর্মীদের জন্য একটি বিরাট কর্মক্ষেত্র। কেবল দেশে নয়, আইসিটিতে দক্ষ কর্মীরা দেশের বাইরে কোনো প্রতিষ্ঠানে অথবা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে। এই কাজের একটি বড় অংশ দেশে বসেই সম্পন্ন করা যায়। আউটসোর্সিং করে এখন অনেকেই বাংলাদেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

২০.প্রশ্নঃ সামাজিক যোগাযোগ কী? সামাজিক যোগাযোগের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুইটি মাধ্যমে বর্ণনা দাও।

skillnubd.com

উত্তরঃ **সামাজিক যোগাযোগ :** মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে চলাফেরা ও বিকাশের জন্য মানুষে মানুষে যোগাযোগের প্রয়োজন। তবে এখন সামাজিক যোগাযোগ বললে ভার্চুয়াল যোগাযোগ ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মানুষে মানুষে মিথস্ক্রিয়াকেই বোঝায়। এর অর্থ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ যোগাযোগ ও ভাব প্রকাশের জন্য যা কিছু সৃষ্টি, বিনিময় কিংবা আদান-প্রদান করে তাই সামাজিক যোগাযোগ।

সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় মাধ্যম : সামাজিক যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেটে প্রায় শতাধিক যোগাযোগ মাধ্যম রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দুইটি মাধ্যম হলো-ফেসবুক ও টুইটার। নিচে এই দুইটি মাধ্যমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো :

ফেসবুক (www.facebook.com) : ফেসবুক সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি ওয়েবসাইট। ২০০৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মার্ক জুকারবার্গ তার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এটি চালু করেন। বিনামূল্যে যে কেউ ফেসবুকের সদস্য হতে পারেন। ব্যবহারকারীগণ বন্ধু সংযোজন, বার্তা প্রেরণ এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি প্রকাশ, আদান-প্রদান ও হালনাগাদ করতে পারেন। এছাড়া এতে অডিও ও ভিডিও প্রকাশ করা যায়। ফেসবুকে যেকোনো প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব পেজ যেমন খুলতে পারে, তেমনি সমমনা বন্ধুরা মিলে চালু করতে পারে কোনো গ্রুপ। মার্চ ২০১৫ অনুযায়ী বিশ্বে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৪১৫ মিলিয়ন।

টুইটার (www.twitter.com) : টুইটারও একটি সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। তবে ফেসবুকের সঙ্গে এর একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এটিতে ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ ১৪০ অক্ষরের মধ্যে তাদের মনোভাব প্রকাশ ও আদান-প্রদান করতে হয়। এজন্য এটিকে মাইক্রোব্লগিংয়ের একটি ওয়েবসাইটও বলা যায়। ১৪০ অক্ষরের এই বার্তাকে বলা হয় টুইট।

২১.প্রশ্নঃ বিনোদন জগতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে বিনোদনের জগতে একটা নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এটি ঘটেছে দুইভাবে। প্রথমত বিনোদনটি কীভাবে মানুষ গ্রহণ করবে সেই প্রক্রিয়াটিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয়ত বিনোদনের ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমগুলোতে একটা গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। নিচে এই পরিবর্তন দুইটি বর্ণনা করা হলো :

বিনোদন গ্রহণের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন : একটা সময় ছিল যখন বিনোদনের জন্য মানুষকে ঘরের বাইরে যেতে হতো। সিনেমা দেখতে সিনেমা হলে যেতে হতো, খেলা দেখতে খেলার মাঠে যেতে হতো, গান শুনতে গানের জলসায় যেতে হতো। এখন এ ধরনের বিনোদনের জন্য মানুষের আর ঘর থেকে বের হতে হয় না। প্রথমে রেডিও, তারপর টেলিভিশন এসেছে। তারপর এসেছে কম্পিউটার। কম্পিউটার সংযুক্ত হয়েছে ইন্টারনেটের সাথে। এভাবেই একসময় আমরা আবিষ্কার করেছি একজন মানুষ তার ঘরে চার দেওয়ালের ভেতরে আবদ্ধ থেকেই পৃথিবীর সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সব ধরনের বিনোদন উপভোগ করতে পারে।

বিনোদন মাধ্যমের গুণগত পরিবর্তন : তথ্যপ্রযুক্তির কারণে বিনোদন গ্রহণের প্রক্রিয়াটিতে যেরকম পরিবর্তন এসেছে ঠিক সেরকম পরিবর্তন এসেছে বিনোদনের বিষয়গুলোতে। সঙ্গীতকে ডিজিটাল রূপ দেওয়ায় এখন আমরা কম্পিউটারে গান শুনতে পারি। ঠিক একইভাবে আমরা ভিডিও বা চলচ্চিত্র দেখতে পারি। সিডি রম কিংবা ডিভিডি বের হওয়ার পর সেখানে বিশাল পরিমাণের তথ্য রাখা সম্ভবপর হয়েছে। সিনেমা হলে না গিয়ে ঘরে বসে কম্পিউটার কিংবা টেলিভিশনে ডিভিডি থেকে চলচ্চিত্র দেখা এখন খুবই সাধারণ একটা বিষয়। ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক বসানোর পর দ্রুতগতির ইন্টারনেট সহজলভ্য হতে শুরু করেছে। কাজেই এখন একজনকে আর গান শোনার জন্য কিংবা চলচ্চিত্র দেখার জন্য অডিও সিডি বা ডিভিডির ওপর নির্ভর করতে হয় না। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরাসরি গান বা চলচ্চিত্র উপভোগ করা সম্ভব হচ্ছে। শুরু তাই নয় রেডিও বা টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে দেখা যায় এবং সেগুলো অনেক সময়েই রেকর্ড করা থাকে বলে কাউকেই আর কোনো কিছুর জন্য নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হয় না, যখন যেটি দেখার ইচ্ছে করে তখনই সেটা দেখতে পারে।

২২.প্রশ্নঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে কী বোঝায়? ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে করণীয় আলোচনা কর।

উত্তরঃ **ডিজিটাল বাংলাদেশ :** ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে গড়ে তোলা আধুনিক বাংলাদেশ বোঝানো হয়। সব ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্যমোচনের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হচ্ছে

skillnbd.com

ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশের পেছনের মূল কথাটি হচ্ছে দেশের মানুষের জন্য গণতন্ত্র, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সুবিচার নিশ্চিত করা এবং এগুলোর জন্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে করণীয় : বর্তমান সরকার প্রথমবারের মতো ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে আমাদের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। যেহেতু আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষই গ্রামে থাকে তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রথম ধাপ হচ্ছে এই গ্রামীণ মানুষকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবার আওতায় নিয়ে আসা। সেজন্য এখনও বিশাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির পুরো সুবিধা পেতে হলে এক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান বাড়াতে হবে, আরও বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে সকল কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে সকল কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগাতে উৎসাহী করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। আর তাহলেই আমরা প্রকৃত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব।

২৩.প্রশ্নঃ Globalization ও Internationalization এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।

উত্তর ঃ

Globalization (বিশ্বায়ন)	**Internationalization (আন্তর্জাতিকীকরণ)**
১.বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যের একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া।	১.বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক, সহযোগিতা ও কার্যক্রম বিস্তারের প্রক্রিয়া।
২.এটি একটি **বৈশ্বিক (global)** ধারণা।	২.এটি একটি **রাষ্ট্রভিত্তিক (international)** ধারণা।
৩.জাতীয় সীমানার গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কমে যায়।	৩.জাতীয় সীমানা ও রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে।
৪.উদাহরণ: বহুজাতিক কোম্পানির বিশ্বব্যাপী ব্যবসা পরিচালনা।	৪.উদাহরণ: দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি বা সাংস্কৃতিক বিনিময়।
৫.লক্ষ্য হলো বিশ্বকে একটি সমন্বিত বাজার ও সমাজে পরিণত করা।	৫.লক্ষ্য হলো বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

skillhubbd.com